Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 192 –196
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত অন্তঃপুরবাসীদের জীবনসংগ্রাম : প্রসঙ্গ রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন'

Life Struggle Of Women, Deprived From The Right To Education : Context Rassundari's 'Amar Jiban'

সৌরভ ব্যানার্জী
প্রাক্তন ছাত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : souravbanerx@gmail.com

Keyword
Rassundari, women education, 19th century, dark era, Amar Jiban.

Abstract
Rassundari Dasi was a prominent figure in the field of Bengali literature. Her biography 'Amar Jiban' which was written in 19th century carrying the social and historical signs of that era. Women had no right to education at that time, they were assumed to be from bedroom to kitchen. Women's education was seemed to be a crime in that society. In that era of darkness Rassundari was born. She taught herself by her own unbelievable efforts. Though she had faced a lot of difficulties but her strong mentality was enough to get rid of all the obstacles. In this essay, the author shown the various aspects of difficulties that women faced to educate themselves in 19th century. Besides that it shown how Rassundari get rid of all her difficulties. Her struggle for existence and education inspired us. In modern age also women get many hurdles for their education. But now the obstacles are less comparing to that age. 19th century was a dark period for women education. To find out the background of that era is main intension. If you want to know the modern age, you must understand the dark era of girl child education.

Discussion
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে রাসসুন্দরী দাসী আজ এক বিস্মৃতপ্রায় নাম। 'নববাবুবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ইত্যাদি গ্রন্থ ও সেগুলির রচনাকারদের যেভাবে আমরা মনে রেখেছি, রাসসুন্দরী দেবী বা দাসীর নাম আমরা সেভাবে হয়তো মনে রাখতে পারিনি। অথচ উনিশ শতকের সমাজ ও সমাজে নারীর অবস্থান জানতে প্রথমেই রাসসুন্দরীর রচিত 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনীর শরণাপন্ন হতে হয়। তাঁর এই রচনায় গ্রামের এক সাধারণ নারীর জীবন কাহিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন গ্রামসমাজের সামাজিক

পরিস্থিতিও পরোক্ষভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'আমার জীবন' গ্রন্থে রাজধানী কলকাতার বাবু সমাজ ও তার সরস চিত্র নেই বলে হয়তো অতটা জনপ্রিয় হয়নি গ্রন্থটি কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যমহলের কাছে।

রাসসুন্দরী দাসী ১২১৬ বঙ্গাব্দে চৈত্রমাসে (১৮১০ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার পোতাজিয়া নামক এক পান্ডববর্জিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হয়ে মা ও জ্যাঠাদের কাছে লালিত পালিত হন। বারো বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের জমিদার সীতানাথ সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এত অল্প বয়সে সংসারের নিবিড় পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়েও রাসসুন্দরী সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টাতেই ধীরেধীরে পড়তে ও লিখতে শেখেন। একজন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কাহিনি লিপিবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি এই গ্রন্থে উঠে এসেছে নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগের করুণ ও অন্ধকারময় চিত্র।

ঐতিহাসিকভাবেও 'আমার জীবন' গ্রন্থটির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় কারণ এটি অনেকের মতে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আত্মজীবনী। তবে এই মতের বিরুদ্ধ মতানুসারীদের মতে এটি প্রথম বাংলা আত্মজীবনী নয়। কারণ 'আমার জীবন' এর প্রকাশসাল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু এর আগেই ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ইতিবৃত্ত' নামে এক আত্মজীবনী রচনা করেন। সুকুমার সেনের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত 'ইতিবৃত্ত'ই প্রথম বাংলা আত্মজীবনী।[১] তবে 'আমার জীবন' গ্রন্থটিকে নারীর রচিত প্রথম আত্মজীবনী বলতে কোন সমালোচকেরই আপত্তি নেই।

রাসসুন্দরী দাসী ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ উনিশশতকের ঊষাকালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু উনিশ শতকের এই ঊষাকাল নারীস্বাধীনতা ও নারীশিক্ষার জন্য ছিল তমশাময় গভীর রাত্রি। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সামাজিক আন্দোলনের পুরোধাদের কার্যকলাপ তখনও শুরু হয়নি। এই সময়ে নারীর লেখাপড়ার অধিকার যে ছিল না তা বলাবাহুল্য। রাসসুন্দরী সেই সময়ের নারীশিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। লেখিকার যখন আট বছর বয়স তখন তাঁর সমবয়সী বালকেরা তাঁদের বাড়িতে অবস্থিত বাংলা স্কুলে পড়ত। বাড়ির বালিকারা সেই সুযোগ পেত না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই যে সেই স্কুলে পড়াতেন একজন ইংরেজ মহিলা। রাসসুন্দরী স্কুলের পাশে কিছু দূরে বসে থাকতেন এবং ওই মেমের ও বালকদের কথা শুনতেন এবং তা মনে রাখার চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> "তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষরে মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়ই থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। ... আমি যে ঐ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না।"[২]

আট থেকে বারো বছরের মধ্যে তাঁর শিক্ষাজীবন এতটাই ছিল। তবে প্রথাগত শিক্ষা বাল্যকালে না পেলেও তিনি তাঁর মায়ের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা বাল্যকালে পান। তাঁর মা তাঁকে জীবনে চলার পথের বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন-

> "তোমার যখন ভয় হইবে, তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও, দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমার আর ভয় থাকিবে না।"[৩]

বাড়ির পাঠশালায় বসে মনে মনে বর্ণপরিচয় শিক্ষালাভ, অল্পবিস্তর গৃহস্থালির কাজকর্ম, বান্ধবীদের সঙ্গে খেলা_ এভাবেই আট থেকে বারো বছর পর্যন্ত তাঁর অতিবাহিত হয়। এরপর হঠাৎ বারো বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বালিকা রাসসুন্দরীর মনে এই বিয়ে নিদারুণ শোক ও দুঃখের উদ্বেক করেছিল। অল্প বয়সে যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করছেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল-

> "তখন আমার মনের ভাব কি বিষম হইয়াছিল! যখন দুর্গোৎসব কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"[৪]

বিবাহের পর বছর কয়েক এভাবেই কান্নাকাটি করে তাঁর কাটে। এরপর ধীরেধীরে সংসার জীবনে পদার্পণ করেন। শ্বশুরালয়ে রাসসুন্দরী গৃহস্থালির কাজকর্ম, সন্তান জন্ম দেওয়া ও তাদের লালন পালনে সদা ব্যস্ত থাকতেন। হাতখানেক ঘোমটার আড়ালে তাঁকে ঘরের সব কাজ কর্ম করতে হত, কারো সঙ্গে কথাও বলতে পেতেন না। এভাবে রক্ষণশীল জমিদার শ্বশুরালয়ে রাসসুন্দরীর জীবন কাটতে লাগল।

রাসসুন্দরীর যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন মনে মনে তিনি ভাবলেন যে তিনি লেখাপড়া শিখে পুথি পড়বেন। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। সেসময় মেয়েদের লেখাপড়া শেখা সমাজধিক্কৃত ছিল। সমাজের শাসনকর্তাদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত হীন মনোভাব ছিল। পাড়ার বয়োঃবৃদ্ধরা মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে ভয়ানক নিম্নরুচির মনোভাব ব্যক্ত করত-

> "তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব! এখন যেমত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।"[৫]

দশ-পাঁচজন ব্যক্তি একস্থানে বসে এসব আলাপ-আলোচনা হামেশাই করত সেকালে। তারা নারীদের সামান্য স্বাধীনতা টুকুও স্বীকার করতে চাইত না। জাতি যাবার দোহাই দিয়ে নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধিকারকে হেয় করত। রাসসুন্দরী এসব কথা শুনে পড়াশুনা করার ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যে কারো সামনে বলতে ভয় পেতেন। একজন সাধারণ ঘরের বউয়ের কাছে এমন সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই তাকে নিরুৎসাহিত করবে। কিন্তু রাসসুন্দরীর তীব্র জেদ ও একাগ্রতা এসব বাধা অতিক্রম করতে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। এছাড়া কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে তাঁকে শক্তি ও ভরসা জুগিয়েছিল ভগবতচিন্তা যা তিনি তাঁর মার থেকে শৈশবে পেয়েছিলেন। সাংসারিক দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো অনীহা প্রকাশ করতেন না। কোন কাজ করলে লোকে ভালবাসবে, কী প্রকারে সকলে সন্তুষ্ট থাকবে সেই প্রচেষ্টাতেই তাঁর প্রত্যেক দিন কাটত। কিন্তু এসবের মাঝেও মনের মধ্যে পড়াশুনা করতে না পারার আক্ষেপ তাঁকে সর্বদা কুঁড়েকুঁড়ে খেত।

তৎকালীন সময়ে ভারতীয় বিবাহিত নারীরা সন্তান উৎপাদনের একপ্রকার যন্ত্র ছিল বলা যায়। রাসসুন্দরীর জীবনেও প্রসববেদনার স্রোত এসেছে একের পর এক। আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব হয়। এরপর প্রত্যেক দুই-তিন বছর অন্তর অন্তর তাঁর সন্তান জন্ম হতে থাকে। আঠারো থেকে একচল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি দশ পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। লেখিকা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> "ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমশ্বের জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না।"[৬]

শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া ও তাদের প্রতিপালনই নয়, রান্না-বান্না, অতিথি সৎকার এবং নানান শোক-যন্ত্রণা তাঁর পড়াশুনার পথে বারংবার বাধা সৃষ্টি করেছিল। সেই আমলে একান্নবর্তী পরিবারে একজন বধূকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতে হত। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> "দশ বারো সের চাউল পাক করিতে হইত। এ দিকে বাটীর কর্তাটির স্নান হইলেন ভাত চাই, অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভালবাসিতেন না। ...এই প্রকার পাক করিতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত।"[৭]

এভাবে সারাদিন রান্নাবান্নার পরে খেতে তাঁর বিকাল বা সন্ধ্যে হয়ে যেত। প্রত্যেক দিন তাঁর ঠিক মতো খাওয়াও হত না। কখনো অতিথি এলে তাকে সেই খাবার খেতে দিতে হত-

> "আমি যখন ভাত খাইতে বসিব, ঐ সময় একজন লোক আসিয়া অতিথি হইল। ...আমার ঐ যে মুখের ভাতগুলি ছিল, সেই ভাতগুলি ঐ অতিথিকে ধরিয়া দিলাম।"[৮]

ঊষাকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবনে সারাদিন তিনি ঠিক মতো খাবারও খেতে পেতেন না। এভাবে সংসারের ঘানি টানতে টানতেই তাঁর মনে হয়েছে যেভাবেই হোক তাঁকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। কিন্তু প্রতিকূলতা কীভাবে জয় করবেন তা ভেবে কূল পেতেন না। তাঁর পরম বাসনা ছিল 'চৈতন্যভাগবত' পুস্তকটি পাঠ করার। গ্রন্থটিকে চিনতেই তাঁকে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের একটি পাতা লুকিয়ে রেখে রান্না-বান্নার মাঝেই সেটিকে দেখতেন। কিন্তু লেখাপড়া না জানার জন্য তিনি কিছু বুঝতে পারতেন না। তাঁর বড় ছেলে তখন তালপাতায় বর্ণ পরিচয় শিখছিল। শৈশবে বাড়ির পাঠশালার পাশে বসে থেকে যে অক্ষরজ্ঞান শিখেছিলেন তা ওই তালপাতার বর্ণ

দেখে পুনরায় মনে পড়ে তাঁর। এরপর বাল্যকালের সেই বিস্মৃতপ্রায় বর্ণজ্ঞান দ্বারা চৈতন্যভাগবতের বর্ণ মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেন অনবরত। সাহায্য নিতেন বড়ছেলের তালাপাতায় লেখা অক্ষরের। লেখিকা এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "আমি সেই পুস্তকের পাতটি ও ঐ তালের পাতটি লইয়া মনের অক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতাম। আমি ঐ প্রকার করিয়া সকল দিবস মনে মনে পড়িতাম। আমি অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে ও অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্য ভাগবত পুস্তকখানি গোঙ্গাইয়া পড়িতে শিখিলাম।"[৯]

এছাড়া সেকালে ছাপার অক্ষর ছিল না। হাতে লেখা পুথির যুগ তখনও চলছে। তাই তাঁকে হাতে লেখা পুথির অক্ষর বুঝতে আরো পরিশ্রম করতে হত। এভাবে অল্প অল্প যখন পড়তে শিখলেন তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। কিন্তু নিজের এই পড়তে পারার কৃতিত্ব তিনি প্রকাশ করতে সামাজিক কারণে ভয় পেতেন-

> "আমার ননদ তিনটি আছেন, তাঁহারা যদি আমাকে পুথি পড়িতে দেখেন, তবে আর রক্ষা নাই।"[১০]

কিন্তু তাঁর এই ভয় সত্যি হয়নি। ননদরা তাঁকে উপরন্তু উৎসাহই দান করেন। রাসসুন্দরীর কাছে তাঁর ননদেরাও লেখাপড়া শিখতে লাগলেন।

রাসসুন্দরীর শিক্ষালাভের পথে অন্যতম বাধা ছিল তাঁর একাধিক পুত্র ও কন্যার অকালমৃত্যু। বারো সন্তানের মধ্যে ছয় পুত্র ও এক কন্যা অকালে মারা যায়। মর্মান্তিক এই শোকসমূহ তাঁর জীবনে বারবার অন্ধকার নিয়ে আসে। কিন্তু এই নিদারুণ শোকও তাঁকে শিক্ষার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। উপরন্তু এই শোক ভোলার জন্য তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠের দিকে আরো মনোযোগ দেন। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, আঠার পর্বের মহাভারত, বিদগ্ধমাধব, রামায়ণ ইত্যাদি ধর্মপুস্তক পাঠ তিনি যত্ন সহকারে একক প্রচেষ্টায় সমাপ্ত করেন। পড়তে শিখলেও লিখতে তিনি অনেক পরে শিখেছেন। তাঁর সপ্তম পুত্র কিশোরীলাল শহরে থেকে কলেজে পড়াকালীন মাকে চিঠি লিখে উত্তর না পেলে, পুত্র কিশোরীলাল চিঠির উত্তর না দেওয়ার কারণ জানতে চায়। তখন রাসসুন্দরী জানান যে তিনি পড়তে শিখলেও লিখতে শেখেননি। তা শুনে কিশোরীলাল মায়ের লেখার জন্য কাগজ, কলম, দোয়াত, কালি ইত্যাদি ক্রয় করে মাকে দেয়। তখন পুত্রের উৎসাহে রাসসুন্দরী লেখা শিখতে শুরু করেন। কিন্তু সংসারের সব কাজ সামলে লেখা শেখা সহজ ছিল না। স্বামীর চোখের চিকিৎসার জন্য কৃষ্ণনগরে ছয়মাসের জন্য তাঁদের থাকতে হয়েছিল। তখন বাড়ির অপেক্ষা সেখানে তাঁর কাজের চাপ অনেক কম ছিল। এই ছয়মাস সময়কালের মধ্যেই রাসসুন্দরী লিখতে শেখেন। এভাবেই ছেলের পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি লিখতে শেখেন।

তাঁর শিক্ষালাভের পথে তাঁর স্বামীর কেমন ভূমিকা ছিল তা 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি একপ্রকার নীরব। তবে তিনি বহুবার বলেছেন তাঁর 'কর্তা' অত্যন্ত সহৃদয় দয়াবান ব্যক্তি ছিলেন। রাসসুন্দরীর স্বামী রাসসুন্দরীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছিলেন তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। রাসসুন্দরী স্বামীর অনুমতি না নিয়েই তাঁর অনুপস্থিতিতে জমিদার মিরালি আমুদের সঙ্গে চলা দীর্ঘকালীন একটি মামলার রফা করেন। স্ত্রীর এই বিষয়কর্মে হস্তক্ষেপে সীতানাথ সরকার অখুশি হননি, বরং অত্যন্ত সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় তাঁর স্বামী তাঁকে পড়াশুনা করার পথে হয়তো বাধা সৃষ্টি করেননি। তবে এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কোন তথ্য না থাকায় নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

রাসসুন্দরী সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় লেখাপড়া শিখে প্রৌঢ়া বয়সে ধীরে ধীরে আত্মজীবনী 'আমার জীবন' রচনা করেন। প্রথম খণ্ড রচনা সমাপ্ত করেন ৬৬ বছর বয়সে। দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন জীবনের অন্তিম লগ্নে ৮৮ বছর বয়সে। প্রথম খণ্ড সুসংঘবদ্ধ ও সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলাহীন ও নীরস। আত্মজীবনের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে ভগবতপ্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। তবে নারীশিক্ষার অন্ধকারযুগে জন্মে তিনি সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টায় শিক্ষার্জন করে ৮৮ বছর বয়স পর্যন্ত তা অবিচ্ছিন্নভাবে চর্চার মধ্যে রেখেছিলেন। উনিশ শতকের বঙ্গসমাজে এমন ঘটনা অদ্বিতীয় ও বিস্ময়কর।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাসসুন্দরীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার জীবন' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন-

> "এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখা আবশ্যক। এমন উপাদেয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।"[১১]

বাস্তবিক ভাবেই একথা অনেকাংশে ঠিক। কারণ উনিশ শতকে কলকাতার মহিলাদেরই লেখাপড়ার চল ছিল না। সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত এক গ্রামের জমিদার বাড়ির রক্ষণশীল আবহাওয়াতে রাসসুন্দরী যেভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তো বিরল। দীনেশচন্দ্র সেন তাই যথার্থই বলেছেন-

> "আমার জীবন পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকেলে হিন্দু রমণীগণের সকলের কথা; এই চিত্রের মত যথাযথ ও অকপট মহিলাচিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।"[১২]

সত্যিই উনিশ শতকের নারীর সামাজিক ইতিহাস, নারী শিক্ষার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'আমার জীবন' গ্রন্থটি অপরিহার্য। বর্তমান যুগের নারীরাও রাসসুন্দরীর শিক্ষার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অদম্য জিদ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে। উনিশ শতকের প্রতিকূল অন্ধকারময় সময়ে তাঁর সাহসী লড়াই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ঐতিহাসিকভাবে। উনিশ শতকের ইতিহাসেই শুধু নয়, নারী ইতিহাসেও রাসসুন্দরী বিশেষ স্বীকৃতি লাভের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ অষ্টম মুদ্রণ, পৃ. ৪৪১ – ৪৪২
২. দাসী, রাসসুন্দরী, আমার জীবন, দে বুক স্টোর, কলকাতা ৭৩, ২য় সংস্করণ ১৯৫৯, পৃ. ৬
৩. তদেব, পৃ. ৭
৪. তদেব, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ৩৪
৭. তদেব, পৃ. ৩৫
৮. তদেব, পৃ. ৩৫
৯. তদেব, পৃ. ৪৫
১০. তদেব, পৃ. ৫৬
১১. তদেব, ভূমিকা
১২. তদেব, গ্রন্থপরিচয়